বঙ্গভঙ্গ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রমাপ্রসাদ ভাস্কর

সুচতুর বড়লাট লর্ড কার্জন (১৮৫৯-১৯২৫) এদেশে জাতীয় আন্দোলনের ধারাকে বিচ্ছিন্ন করার যে অপচেষ্টা নিয়ে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করতে এক সরকারী সিদ্ধান্ত নেন, তার প্রতিবাদে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ আলোড়ন ও আন্দোলন গড়ে ওঠে তা 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' নামে পরিচিত। স্বদেশ চেতনা-সঞ্জাত 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' প্রণেতা মুর্শিদাবাদের প্রতিভাধর সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানী সর্বসুন্দর রামেন্দ্রসুন্দর এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে যেভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন, সে ইতিকথা যেমন আকর্ষণীয় তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ।

শাসনকার্যেসুবিধা হবে এই অজুহাতে ০৩.১২.১৯০৩ তারিখে ভারত সরকারের সচিব রিজলি এক পত্রে বাংলা সরকারের কাছে প্রস্তাব করেন যে ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের সঙ্গে যুক্ত হোক। তাঁদের অভিমত ছিল এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলি কলকাতার অনিষ্টকর প্রভাবমুক্ত হবে এবং পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা নায্য বিচার পাবে। বড়লাট কার্জন এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি জানান। সংবাদপত্রে ১২ ডিসেম্বর, ১৯০৩ এই প্রস্তাব প্রকাশিত হলে পূর্ববঙ্গে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই বঙ্গ বিভাগের পশ্চাতে কার্জনের যে কূট রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল, সকলের কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কার্জন লক্ষ করেন যে 'যত কিছু রাজনৈতিক উত্তেজনা ও আন্দোলন তার উৎপত্তিস্থান এই বাংলাদেশ।' সুতরাং বঙ্গ বিভাগের ফলে বাঙালি জাতির শক্তি খর্ব ও খণ্ডিত হবে। এ ছাড়া কার্জন গোপনে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়কে বঙ্গ বিভাগের পক্ষে প্ররোচিত করে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে দেশবাসীকে দুর্বল করার হীন অপকৌশলও করেন।[১] এই অভিসন্ধি প্রকৃতপক্ষে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গেই ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর হতে ১৯০৪-এর জানুয়ারির মধ্যেই প্রায় ৫০০ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিব্রত বড়লাট কার্জন ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গ সফরে যান। তিনি চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহের নানান স্থানে জনসভা করে কৌশলে ভয়-প্রলোভন দেখিয়ে জনসাধারণের সম্মতিলাভের চেষ্টা করেন ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষ বপন করেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ সহ বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় মুসলমান এই দাবিকে স্বাগত জানান। এতে সমগ্র বঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে। 'কলকাতা টাউন হলে ১৮.০৩.১৯০৪ রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪০-১৯২৪) সভাপতিত্বে বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় এত মানুষ সমবেত হয়েছিল যে, তিনটি স্বতন্ত্র সভার আয়োজন করতে হয়েছিল আয়োজকদের।"[২]

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুলাই সিমলা থেকে ঘোষিত হয় যে ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, দার্জিলিং ও সমস্ত রাজশাহী বিভাগ এক করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে এক নূতন প্রদেশ গঠিত হবে ও সে প্রদেশের শাসনভার ছোটলাটের উপর ন্যাস্ত থাকবে। ঢাকা হবে প্রদেশের রাজধানী। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাঙালি জাতি ক্ষোভে ফেটে পড়ে ও

দিগ্বিদিকে প্রবল জনবিক্ষোভ শুরু হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনকালে ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৯-১৯২৪) এই বঙ্গভঙ্গে আপত্তি তোলেন। 'দি বেঙ্গলী' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রবল আপত্তি জানানো হয়। 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় যে,বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়েই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এমনকী ইংরেজ পরিচালিত ইংরেজি সংবাদপত্রগুলিতেও (যেমন 'ইংলিশম্যান,' 'স্টেটস্‌ম্যান,' 'পাইওনিয়ার' ইত্যাদি) বঙ্গ ভঙ্গের তীব্র নিন্দা করা হয়। লন্ডনের 'ডেলি নিউজ' পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে 'অদূরদর্শী রাজনীতিক জ্ঞানের পরিচায়ক' বলে মন্তব্য করা হয়।[৩] খ্যাতনামা সাংবাদিক কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬) তাঁর 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ১৩.০৭.১৯০৫ তারিখে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সর্বপ্রথম ইংরেজের বিরুদ্ধে সামগ্রিক 'বয়কট যুদ্ধ' ঘোষণা করেন।[৪] এই 'বয়কট' আহ্বানে সাড়া দিয়ে শহরে ও মফস্‌সলে দিকে দিকে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তবে এসব প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে সরকার ২০ জুলাই ১৯০৫ চূড়ান্ত প্রস্তাব ঘোষণায় জানায় যে ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ বঙ্গ বিভাগের দিন ধার্য হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৭ আগস্ট ১৯০৫ কলকাতা টাউন হলে এক ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (১৮৬০-১৯২৯)।[৫]

অসংখ্য নেতৃবৃন্দ এবং প্রতিটি জেলার প্রতিনিধি, ছাত্রবৃন্দ এবং অগণিত জনসমাগমের ফলে এই সভা এক অপূর্ব রূপ ধারণ করে। বিকেল পাঁচটায় সভা আরম্ভের কথা, কিন্তু বেলা দুটো হতেই ছাত্রদলের মিছিল শুরু হয়! কালো পতাকা নিয়ে ছাত্ররা কলকাতার বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে গোলদিঘির তীরে সমবেত হয়। সেখান হতে প্রায় পাঁচ হাজার কলেজের ছাত্রেরা শিক্ষকদের নেতৃত্বে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ধীর পদক্ষেপে একযোগে টাউন হলের দিকে অগ্রসর হয়। তাদের হাতে কালো পতাকায় 'সংযুক্ত বঙ্গ,' 'একতাই শক্তি,' 'বন্দেমাতরম্,' 'বঙ্গভঙ্গ চাই না' ইত্যাদি বাক্য এবং মুখে শোকের চিহ্ন। এরূপ বিশাল ও শ্রেণীবদ্ধ শোকযাত্রা কলকাতায় পূর্বে কেউ দেখেনি! টাউন হলেও অভূতপূর্ব ও অপরূপ দৃশ্য — রাজা, জমিদার, উকিল, শিক্ষক ও অগণিত লোকের এত ভিড় হয় যে টাউন হলের ভিতরে সকলের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বাইরের প্রাঙ্গণ দুটিতে অতিরিক্ত সভার ব্যবস্থাও করতে হয়। তবে প্রধান সভার সভাপতি ছিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।[৬]

এই ঐতিহাসিক সভায় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র সভাপতির ভাষণে আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে বলেন যে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলা ভাষাভাষী জাতির ওপর এটাই সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক দুর্যোগ। এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠায় কাশিমবাজার রাজপরিবারের অবদান রয়েছে। ভয়ঙ্কর বিপদের সময় ওয়ারেন হেস্টিংসের জীবনরক্ষাও তাঁর পরিবারই করেছিলেন। তাই সরকারকে পরামর্শ দেবার বংশগত অধিকার তাঁর রয়েছে। ইংরেজ শক্তির সৃষ্টি ও বিকাশের সঙ্গে জড়িত এক ঐতিহ্যময় পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে একথা বলেন যে, বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত এক রাজনৈতিক মহাভুল এবং সরকারের উচিত এর নির্দেশাবলি এবং পরিকল্পনা প্রত্যাহার করা। এছাড়া মহারাজ তাঁর ভাষণে সমগ্র দেশের জনসাধারণকে এই বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বানও জানান।[৭]

কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর 'আত্মচরিত'-এ আরও জানিয়েছেন — '১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ আগষ্ট টাউন হলে প্রতিবাদ সভা হইল। তথায় কী কী প্রস্তাব হইবে ইহা নির্ধারণের জন্য কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মিলিত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেন্টের কার্যের প্রতিবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে টাউন হলের সভায় বিলাতি দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব করা হইবে, ইহা নির্ধারিত হয়।

'বিলাতি দ্রব্য বর্জন করা হইবে ইহা শুনিয়া বাংলার যুবকগণ প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ৭ আগষ্ট দ্বিপ্রহরের সময় বহু সহস্র যুবক কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইয়াছিল; তাঁহারা মস্তকে গেরুয়া রঙের উষ্ণীষ পরিধান করিয়া এবং বক্ষে 'বঙ্গভঙ্গ রহিত করিতে হইবে' এই কথা অঙ্কিত উত্তরীয় বাঁধিয়া, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে হলের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। সেই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া কলিকাতাবাসী স্বদেশীভাবে মত্ত হইয়াছিল।'[৮]

'ভারতকোষ (পঞ্চম খণ্ড)'-মতে 'এই আন্দোলন বিশেষ কোনও শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯০৫-এর আন্দোলন শুধু বাংলার শহরে মফঃস্বলে সীমিত ছিল না, ইহার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ, বিহার ও ওড়িশা ছাড়াও যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ইত্যাদি অঞ্চলেও শ্রুত হয়। আন্দোলনের ভয়াবহ রূপ লক্ষ্য করিয়া ইংরেজ শাসকবৃন্দ দমননীতির আশ্রয় লইলেন। ১০ অক্টোবর কার্লাইল সার্কুলার জারি হইল। ছাত্র সমাজকে রাজনৈতিক সভা বা বক্তৃতা ও পিকেটিং হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা ছিল ইহার উদ্দেশ্য। কার্লাইল সার্কুলার-এর প্রতিবাদে নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে বাংলার যুব সম্প্রদায় গঠন করিলেন 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি।' আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'ডন সোসাইটি' আন্দোলনের সাংস্কৃতিক দিক পরিস্ফুট করিতে সাহায্য করে।'[৯] এই আন্দোলনের ব্যপ্তি চমকপ্রদ। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০) জানিয়েছেন — '১৯০৩ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯০৫ সনের অক্টোবর মাসের মধ্যে অন্ততঃ ৩০০০ প্রকাশ্য সভায় জনসাধারণ ইহার প্রতিবাদকরে। বাংলার সর্বত্র এইরূপ সভার অধিবেশন হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের এই সমুদয় সভায় যোগদান এবং এই সকল সভায় ৫০০ হইতে ৫০,০০০ শ্রোতা উপস্থিত থাকিতেন।

'সরকারী বিবরণ অনুসারেও সাধারণ লোকের অন্ততঃ ৫০০ প্রতিবাদ সভা হইয়াছিল এবং ৭৫,০০০ লোকের স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবাদপত্র পাঠান হয়।'[১০]

০৭.০৮.১৯০৫ তারিখে টাউন হলের জনসভাকালে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন না। ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম ঢেউটি চলে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন। তবে ২৫.০৮.১৯০৫ এই টাউন হলেই 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধ পাঠের আসরে রবীন্দ্রনাথ সদ্যরচিত 'আমার সোনার বাংলা' গানটি পরিবেশন করেন। সে সময় তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম চারণকবির ভূমিকা নেন বলেই মাসখানেকের মধ্যে প্রায় ২২/২৩টি উত্তেজনাময় স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেন।[১১] আবার ২৭.০৯.১৯০৫ তারিখে ১৮/৪, অক্রুর দত্ত লেনে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে সাবিত্রী লাইব্রেরী স্বধর্ম সাধন সমিতির এক অধিবেশনে 'রবীন্দ্র সুহৃদ' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১), বিহারীলাল সরকার (১৮৫৫-১৯২১), শ্রীশচন্দ্র সর্বাধিকারী (১৮৫৮-১৯১২), নিখিলনাথ রায় (১৮৬৫-১৯৩২), অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯), মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা (১৮৫৮-১৯১৯), নগেন্দ্রনাথ

ঘোষ (১৮৫৪-১৯০৯), ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯৩৭), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) প্রমুখের উপস্থিতিতে 'রাখীবন্ধন'-এর প্রস্তাব সম্ভবত প্রথম ঘোষিত হয়।[১২] এ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ রাখীসঙ্গীত 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি রচনা করেন।

বঙ্গভঙ্গের দিন (১৬.১০.১৯০৫) সকালে গঙ্গায় স্নানের পর 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গাইতে গাইতে বিডন উদ্যানে, সেন্ট্রাল কলেজে ও অন্যত্র নানাস্থানে রাখীবন্ধন হয়। অপরাহ্ণে অখণ্ড 'বঙ্গভবন' স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলকাতার পার্শিবাগানের মাঠে 'মিলন মন্দির'এর ভিত্তি স্থাপিত হয়। রোগশয্যাগত আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬) সভাপতিত্ব করেন। প্রায় পঞ্চাশ হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন। এরপর সভাপতির স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণাপত্র পঠিত হয়। ইংরেজিতে আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৪) ও বাংলায় রবীন্দ্রনাথ তা পাঠ করেন।[১৩] সভা ভঙ্গ হলে বিপুল জনতা পশুপতি বসুর বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথও তাদের মধ্যে ছিলেন এবং সহস্র কণ্ঠে তাঁর নতুন গান 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে' গাইতে গাইতে জনতা সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে এগিয়ে চলে। এরপর রবীন্দ্রনাথ আর একটি গান ধরেন,তা হল 'বিধির বাঁধন কাটবে তুবি এমন শক্তিমান।' সন্ধ্যাবেলা পশুপতিনাথ বসুর (১৮৫৫-১৯০৭) গৃহপ্রাঙ্গনে বিরাট জনসভা হয়। অনেকে অনুমান করেন উপস্থিত লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হবে। স্বদেশী বস্ত্র তৈরি করতে চতুর্দিক হতে স্বতঃস্ফূর্তদানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। পরে আরও কুড়ি হাজার টাকা আদায় হয়।[১৪] তবে ১৭.১০.১৯০৫ তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' হতে সেদিন প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯.১০.১৯০৫ রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহির হিসাব অনুযায়ী তিনি ১০০ টাকা জাতীয় ভাণ্ডারে অর্থসাহায্য করেন।[১৫]

আবার দেখি দেশমাতৃকার টানে রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের (১৮৮২-১৯৩৫) সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও (১৮৬৩-১৯১৫) বেহালা হতে পথে পথে বেড়িয়েছেন।[১৬] আর শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) 'ঘরোয়া'-য় সেদিনের রাখীবন্ধনের আবেগাপ্লুত বর্ণনায় বলেছেন — 'সামনে যাকে পেতাম, তারই হাতে বাঁধতাম রাখি। সরকারী পুলিস এবং কনস্টেবলদেরও বাদ দিতাম না। মনে পড়ে, একবার একজন কনস্টেবল হাতজোড় করে বলেছিল, মাফ করবেন হুজুর, আমি মুসলমান।' এরকমভাবেই প্রতিবাদ সভা, পারস্পরিক ঐক্য বিধানের প্রচেষ্টা ও সঙ্গীতময় পথ পরিক্রমায় আন্দোলন অগ্রগতি পেতে থাকে।

এই সময়কালে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে জোরদার করতে এক সভায় কাব্যিক ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তার একাংশ হল — 'হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ কর। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত নদীজালজড়িত পূর্ব সীমান্ত হইতে শৈলমালা বন্ধুর পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত কর। যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর — যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর। শঙ্খ মুকরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর। অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নামাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার

শাখা-প্রশাখা বহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও — আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে, সেই নিস্তব্ধ শুচিরুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দেমাতরম্' গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক্ — একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর —

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুন্য হউক, হে ভগবান।'

বাংলার সর্বত্র অসংখ্য সভায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদস্বরূপ বিলিতি দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত ও কার্যকরী হতে থাকে। বিদেশী পণ্যসম্ভার বিশেষ করে ম্যাঞ্চেস্টারের সূতীবস্ত্র বর্জন করার আহ্বান ক্রমেই তীব্র হয় ওঠে। ছাত্রেরা বিলিতি লবণ ও চিনি খরিদ করে তা নষ্ট করতে শুরু করে; শহরের বড় বড় দোকানে ছাত্রদের পিকেটিং শুরু হয় এবং ক্রেতাদের বিলিতি পণ্যসম্ভার না কেনার অনুরোধ করা হয়। বিলিতি পণ্য সম্ভারের বয়কট করার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ নাগরিকদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কটও শুরু হয়। ধোপা, নাপিত, মুচি প্রভৃতি শ্রেণীর সমাজসেবীরা ইংরেজদের সব রকমের সেবা করা থেকে বিরত থাকে।[১৭] পুলিশ ফাইল (২৫/০৬) হতে জানা যায় কালীঘাট মন্দিরের পুরোহিতরাও তাদের বাড়ি পুজো করতে যেতেন না, যারা বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করছেন।[১৮] এই বয়কটের অনুসঙ্গেই আসে জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা। শিক্ষাসচিব ডবলিউ কার্লাইল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরেই একটি নির্দেশে শিক্ষার্থীদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান এবং 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এরই প্রতিবাদে ১৬ নভেম্বর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬৫-১৯৪৮) আহ্বানে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত (১৮৩১-১৯১৪) এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৪২) প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এই আন্দোলনে নারীদের যোগদান এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মধ্যবিত্ত নারীরা দলে দলে শোভাযাত্রা ও পিকেটিং-এ যোগ দেন। এ সময় হতেই দেখা যায় ভারতীয় নারীরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ধীরে ধীরে সামিল হতে থাকেন। এ ছাড়া স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রচলিত ধারণা হল, হিন্দু নেতারা মুসলমানদের উপেক্ষা করেছিলেন। তবে পুলিশ দপ্তরের গোপন ২৫/০৬ ফাইলে ও ২৬৬/১৯০৮ ফাইলে বলা হয়েছে হিন্দু নেতারা মুসলমানদের সঙ্গে পাবার জন্য বিশেষ প্রয়াস ('গ্রেট এফর্টস'), এমনকী মুসলমানদের 'প্রশস্তি' পর্যন্ত করতেন তাঁদের ভাষণে। সে আমলের গোপন বিপ্লবী ইস্তেহার 'সোনার বাঙ্গলা'-তেও মুসলমানদের আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করা হয়েছিল। তবে প্রচারের ভাষায় এবং আন্দোলনের প্রকরণে হিন্দুধর্মীয় অনুসঙ্গ যে পরিপৃক্ত হয়ে গিয়েছিল তা-ও অস্বীকার করা যায় না।[১৯] যদিও আব্দুল রসুল, লিয়াকৎ হুসেন[২০], আব্দুল হালিম গজনভি, মহম্মদ ইসমাইল চৌধুরী প্রমুখ মুসলমান নেতারা বয়কট আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর গভীর

প্রভাব বিস্তার করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার রাজাবাজারে মুসলমানদের এক বিশাল জনসমাবেশ হয়। এতে পৌরোহিত্য করেন আব্দুল রসুল।[২১]

আবার সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন— 'স্বদেশী গানের একটা প্রধান অবলম্বন ছিল ধর্মীয় প্রতীক আর বাক্-প্রতিমা। দেশকে শুধু জননী নয়, দুর্গা বা চণ্ডী বলেও বন্দনা করা হতো। পাশাপাশি আরার এটাও সত্য যে, স্বদেশী যুগের কবি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'মুসলমানি' বাঙলাতেও গান লিখেছিলেন। সেই গানটি : 'এখন মুসলমানের ইমান কোথা/নাছারার বাহার' — পাওয়া যাবে কাব্য বিশারদ সম্পাদিত স্বদেশ সঙ্গীত সংকলনে (আশ্বিন ১৩১২)। এ ছাড়া সরলা দেবী তাঁর বিখ্যাত 'অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী' গানে 'বন্দেমাতরম্'-এর সঙ্গে 'আল্লা হো আকবর' আর 'সৎশ্রী আকাল' ধ্বনিও যুক্ত করে দিয়েছিলেন।[২২] এ ছাড়া স্বদেশী যুগের আর একটি অসামান্য গান — 'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু' লেখা হয়েছিল স্বদেশী রামায়ণ পালার অংশ হিসাবে। গীতিকার ছিলেন সম্ভবত কালীঘাট মন্দিরেরই এক ভক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে সরকারী নির্দেশে 'বন্দেমাতরম্' নিষিদ্ধ হলে লিয়াকত হোসেন নামে এক স্বদেশী সংগঠক ওই গানটি গেয়ে গরিব ছাত্রদের সাহায্যের জন্য চাঁদা তুলতেন।[২৩] আবার ময়মনসিংহের মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মোমিনরা সেদিন বেঁধেছিলেন মৈত্রীর গান — 'রাম-রহিম না জুদা করো ভাই/ দেশের কথা ভাবো কী।' এভাবেই এই আন্দোলন জাতিধর্ম নির্বিশেষে জনমনে আলোড়ন তোলে ও সমগ্র বঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।

এই পথ ধরেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন মুর্শিদাবাদ জেলার নানান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ড. খায়রুল আনম লিখেছেন — 'ব্রিটিশ সরকারের হোম পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের একটা ইতিহাস প্রস্তুত করে। এই ইতিহাসে ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯০৫) তারিখে বহরমুপরে অনুষ্ঠিত এক বিশাল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই সভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অনেক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই সভায় বহরমপুর, কান্দি, জঙ্গিপুর, আজিমগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের জনসাধারণ যোগ দেয় এবং এই সভায় মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বৈকুণ্ঠনাথ সেনের মতো নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন। ১৯০৫-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর বৈকুণ্ঠনাথের সভাপতিত্বে জিয়াগঞ্জে এক বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় স্থানীয় জমিদারগণ, সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, পান্নালাল সিন্‌হা, হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ,ব্যাঙ্কারগণ, বণিকগণ, দোকানদার ও দিনমজুর ইত্যাদি সমাজের সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ ভারী বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সমবেত হয়েছিল। অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনায় স্বদেশী আন্দোলনকে জোরদার করার এবং স্বদেশী বস্ত্র কারখানা এবং হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণের অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' মন্তব্য করে — জিয়াগঞ্জের সভার মতো অত উৎসাহ এবং উদ্দীপনা আর কোথাও লক্ষ করা যায়ইন। ডোমকল থানা এবং জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় সর্বত্র অনুরূপ স্বদেশী সভা, মিছিল ও আন্দোলন চলতে থাকে। প্রতিটি স্থানে বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ এবং স্বদেশী শিল্পের প্রসারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসব মিটিং মিছিলে সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করে। ১লা নভেম্বর, ১৯০৫ তারিখে ভবানীকিশোর চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বহরমপুরে একটা বড় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ওই সভায় 'পিপ্‌লস প্রোক্লামেশন' পাঠ করা হয় এবং ছাত্রদের উপর আরোপিত সরকারী

সার্কুলার (কার্লাইল সার্কুলার) অমান্য করে তাদেরকে স্বদেশী আন্দোলন চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়।'[২৪] এভাবেই মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি, জঙ্গিপুর, আজিমগঞ্জ, লালবাগ প্রভৃতি অঞ্চলে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের বিস্তার ঘটে।

২০ জুলাই ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের সংবাদ ঘোষিত হওয়ার পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মাঝে মাঝে সহকারী সভাপতি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসে পরিষদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জানান, 'বাঙলা দেশ এবং বাঙালী জাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্য পরিষৎ যদি সে সমস্ত বার্তা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের জীবন সার্থক হইবে। এই কার্য্যের জন্য সমস্ত বাংলা দেশ ব্যাপিয়া সমস্ত বাঙালী জাতিকে জাগাইয়া তোলা পরিষদের সম্প্রতি মুখ্য কর্তব্য। আপাততঃ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কলকাতায় না করিয়া বাংলার ভিন্ন ভিন্ন নগরে পর্য্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত করিলে কার্য্যটার সূচনা হইতে পারে।'[২৫] — প্রস্তাবটি রামেন্দ্রসুন্দরের মনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় উৎসাহ জোগায়। তিনি পরিষদের ১৩১২ সালের কার্য বিবরণে এই প্রসঙ্গে লেখেন — 'জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য জাতীয় ঐক্যবন্ধন রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। বঙ্গ বিভাগের পর এই কথাটা অনেকের মনে স্পষ্টভাবে উঠিয়াছিল। এই বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য বর্ষে বর্ষে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন নগরে সাহিত্য-সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্য-সেবীদিগের মিলন-সাধন এবং বাঙ্গালীর প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস ও বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা চলিতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভে গত ভাদ্র মাসে টাউন হলে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ওই প্রবন্ধে তিনি এই প্রস্তাব সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সাহিত্যপরিষৎকে এইরূপ বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন করিতে অনুরোধ করেন।'[২৬]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমে সমগ্র বঙ্গসমাজকে সচকিত করার এই যে উদ্যোগ, এতেও রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ফুটে ওঠে। তবে দেশপ্রেম ছিল তাঁর সহজাত। তাই দেখি তিনি প্রথম জীবনে কলেজে চোগা-চাপকান পরলেও আদর্শ বাঙালি হিসাবে আজীবন ধুতি-চাদরই পরতেন। এ ছাড়া ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ জাতীয় আন্দোলনের দিনটিকে চিরজাগরূক রাখতে রবীন্দ্রনাথ যেমন রাখীবন্ধনের কথা বলেন তেমনই রামেন্দ্রসুন্দর ক্ষোভসূচক অরন্ধনের পরিকল্পনা করেন। এই অরন্ধনের ঘোষণা করে রামেন্দ্রসুন্দর অভিনবভাবে তা সামাজিক ব্রত অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করেন, আর এই মানসিকতা হতে জন্ম নেয় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা।' সমাজের অন্যতম প্রেরণাদাত্রী স্ত্রীজাতিকে আন্দোলনের শরিক করে শক্তিরূপিণী স্ত্রীজাতির জন্য অপূর্ব ভাব ও ভাষায় তিনি যে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রচনা করেন, তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও এক অনন্য সৃষ্টি। পুস্তিকার ভূমিকায় লেখেন — 'বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের দিন অপরাহ্নে জেমো-কান্দি গ্রামের অর্দ্ধ-সহস্রাধিক পুরনারী আমার মাতৃদেবীর আহ্বানে বাড়ীর বিষ্ণুমন্দিরের উঠানে সমবেত হইয়াছিলেন; গ্রন্থোক্ত অনুষ্ঠানের পর আমার কন্যা শ্রীমতী গিরিজা কর্তৃক এই ব্রতকথা পঠিত হয়।'

বাংলা গ্রামীণ জীবনযাত্রায় মেয়েরাই নানাবিধ আচার ও পুজো অনুষ্ঠান পালন করার ক্ষেত্রে ব্রতকথা ব্যবহার করেন। মানুষের ঐহিক আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তিতে ব্রতকথার ভূমিকা

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি এই ব্রতকথাতেও যেমন প্রতিবিম্বিত হয় তেমনই ভাগ্যের বিড়ম্বনা, সাফল্য ও শান্তির কামনা রয়েছে বলেই তা আমাদের এত প্রিয় ও আকর্ষণীয়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য অনুপ্রাণিত করতেই রামেন্দ্রসুন্দর প্রচলিত ব্রতকথার আঙ্গিকেই 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' গড়ে তোলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর জীবনীকার আশুতোষ বাজপেয়ী এই গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছেন — 'গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র উহাকে আমরা একখানি ক্ষুদ্র গদ্য কাব্য বলিতে পারি। উহাতে বাঙ্গালাদেশের একটা ঐতিহাসিক বিবরণ অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে রাজার ও প্রজার অনাচারের জন্য বাঙ্গালার লক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া বাঙ্গালা ছাড়িবার সঙ্কল্প করিলে, রাজা এবং প্রজার কাতর প্রার্থনায় তিনি আবার বঙ্গদেশে অচলা হইয়া বাস করিবার ভরসা দিয়াছিলেন; তাহার কয়েকটি চিত্র গ্রন্থকার অতি নিপুণ হস্তে অঙ্কিত করিয়াছিলেন।' — (পৃ. ১৮১)

তাঁর (রামেন্দ্রসুন্দরের) একান্ত বিশ্বাস ছিল এই পুস্তিকা পাঠ ও ব্রতপালনে বঙ্গের নারীরা সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর কাছে প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প নিয়ে দেশমাতৃকার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ সৈনিকরূপে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে। ১৩১২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' প্রকাশিত হয়। তবে পুস্তক আকারে তা ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে প্রকাশিত হয়।

'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'য় বর্ণিত 'অনুষ্ঠান'-এ বলা হয়েছে : বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। সে দিন অরন্ধন। দেবসেবা ও রোগীর ও শিশুর সেবা ব্যতীত অন্য উপলক্ষে গৃহে উনুন জ্বলিবে না। ফলমূল চিড়ামুড়ি অথবা পূর্বদিনের রাঁধা-ভাত ভোজন চলিবে।

'পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘটস্থাপন করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিন্দুর লইবেন। হরীতকী বা সুপারী হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথা শেষে বালকেরা শঙ্খধ্বনি করিলে পর ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বাম হস্তের (বালকের দক্ষিণ হস্তের প্রকোষ্ঠে স্বদেশী কার্পাসের বা রেশমের হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখী বাঁধিয়া দিবেন। রাখীবন্ধনের সময় শঙ্খধ্বনি হইবে। তৎপরে পাটালি প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। সংবৎসরকাল যথাসাধ্য বিদেশী, বিশেষতঃ বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিবেন। সাধ্যপক্ষে প্রতিদিন গৃহকর্ম আরম্ভের পূর্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টিভিক্ষা রাখিবেন এবং মাসান্তে বা বৎসরান্তে উহা কোনরূপ মায়ের কাজে বিনিয়োগ করিবেন।'

— এই অনন্যসাধারণ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বদেশের জন্য রামেন্দ্রসুন্দর এক অসামান্য ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন! 'মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার-২০০৩' মতে 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পুস্তকখানি সমগ্র বাংলার জনসাধারণকে বিশেষ করে মহিলাদেরকে হিন্দু মুসলিম ঐক্য বজায় রাখার এবং স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য আহ্বান জানায়। জনসাধারণের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে এবং স্বদেশী আন্দোলনে তথা বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে মানুষকে প্রেরণা জোগায়। বাংলায় বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথার প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রিটিশ সরকার ও পুলিশ উদ্বিগ্ন হয়ে এই পুস্তখানি বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯১০ সালে সরকার পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করে। ইন্টেলিজেন্স (সি আই ডি বেঙ্গল) বা গোয়েন্দা

দপ্তরের কর্তৃপক্ষ এক রিপোর্টে লিখেছেন, 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রিপন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পুলিশ কমিশনারের কাছে এই মর্মে লিখিত মুচলেকা দিয়েছেন যে এই পুস্তকের আর কোন প্রকাশ করবেন না এবং পুস্তকটির যে কপিগুলি তখনও বিক্রয় হয়নি সেগুলি প্রকাশকের নিকট থেকে নিয়ে পুলিশ কমিশনারের কাছে জমা দিবেন। পরবর্তী রিপোর্টে পুলিশ কমিশনার লিখেছেন, 'আমার পূর্ববর্তী রিপোর্ট অনুযায়ী বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পুলিশ কমিশনারের নিকট তাঁর পুস্তকের (বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা) ১,৯৬১খানি কপি জমা দিয়েছেন।' এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা স্বদেশী আন্দোলনের সম্প্রসারণে, জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ প্রচার করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।'[২৭]

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় তা ক্রমে ক্রমে দেশে পরাধীনতার বিরুদ্ধে জাগরণের জোয়ার আনে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সম্মেলন হয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাশিমবাজার রাজবাড়িতে। সভাপতি রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধনী ভাষণের পর সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর 'সাহিত্য সম্মেলন' নামক সারগর্ভ প্রবন্ধেও দেশমাতৃকা প্রসঙ্গটি অপূর্বভাবে তুলে ধরেন। দেশাত্মবোধের আন্তরিক প্রেরণায় তিনি বলেন — 'আজিকার দিনে বঙ্গের সাহিত্যসেবীর এক বই দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতে পারে না। যিনি যে কামনা করিয়া কর্ম করিবেন, তাঁহাকে সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীর চরণে সেই কর্মফল অর্পণ করিতে হইবে। ... যে মায়ের পূজা করিব বলিয়া বাঙ্গালী আজ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, আমরা সাহিত্যসেবীরা আমরাও আমাদের সামর্থ অনুসারে সেই মায়ের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইব।' এতে দেখা যায় এই সম্মেলনে মাতৃভাষাকে 'মা' এবং বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সাধনে আত্মনিয়োগকে 'মাতৃপূজা' জ্ঞান করার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে যে প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছিল, তার প্রধান যাজ্ঞিকও ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর! একদা রবীন্দ্রনাথ এক অভিনন্দন পত্রে লেখেন, 'তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।'[২৮] রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দনধন্য সর্বসুন্দর রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রচনা করেন, তার কাব্যিক মূল্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক মূল্যও অসীম।

সূত্র নির্দেশ

১. *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (প্রথম খণ্ড)* — নেপাল মজুমদার, ১৯৯৫, পৃ. ২২৬

২. *বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ* — সম্পাদনা : কমল চৌধুরী, ২০০৫, পৃ. ৩৩-৩৪

৩. *ভারতের ইতিহাস* — অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ১৯৯৭, পৃ. ৬২

৪. 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ১৩ জুলাই ১৯০৫ লেখা হয় :

'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙ্গালীর চিরশৌচ হইবে। যতদিন বঙ্গদেশের ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় একত্র না হয় ততদিন বাঙ্গালী শোকচিহ্ন ধারণ করিবে। বাঙ্গালী আমোদ-প্রমোদ পায়ে ঠেলিয়ে সমস্ত বঙ্গ এক করিবার মহাসাধনায় প্রবৃত্তহইবে। যতদিন সাধনায় সিদ্ধ না হইবে ততদিন তপশ্চর্য্য করিবে। জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙ্গালী বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করিবে। করকচ খাইবে, তবু বিদেশী লবণ খাইবে না। গুড় খাইবে, তবু বিদেশী চিনি খাইবে না। জাতীয় অশৌচের সময় বাঙ্গালী আর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, জেলা বোর্ড বা লোকাল বোর্ডের সভ্য, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট থাকিতে পারিবে না। জাতীয় অশৌচের সময়, ছোট লাট, কমিশনার ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধে কোন কাজের জন্য আর অর্থদান করা হইবে না। যতদিন

জাতীয় শোকের অবসান না হয়, ততদিন রাজপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাবে আমাদের কেহ যোগ দিতে পারিবে না।

লর্ড কার্জন বাঙ্গালীর সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যদি তিনি উদ্যত খড়্গ সম্বরণ না করেন, বাঙ্গালী আর রাজপুরুষদিগের সংস্রবে যাইতে পারিবে না।' — (পৃ. ৩৫)

৫. 'অমৃতবাজার পত্রিকা' — ০২.০৭.১৯০৫

'মুর্শিদাবাদের নাগরিকগণ বহরমপুরের গ্র্যান্ট হলে বহরমপুর এ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে এক সভায় সমবেত হন। এই সভায় কলকাতার টাউন হলে ৭ই আগষ্ট (১৯০৫) এক প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভায় জেলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (কাশিমবাজারের মহারাজ), নসীপুরের রাজাবাহাদুর, রায়বাহাদুর শ্রীনাথ পাল এবং মণিলাল নাহার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, তারকচন্দ্র চক্রবর্তী এবং আর.রায়কে নির্বাচিত করা হয়।' (মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার — ২০০৩)

৬. *বাংলা দেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)* — রমেশচন্দ্র মজুমদার, ২০০০, পৃ. ২৮-৩০

৭. *History of the Cossimbazar Raj (Vol. 2)* – Somendra Chandra Nandi :

'He (Maharaja Manindra) also emphasised, as he later did in the Imperial Legislative Council, that as a Permanent Settlement Zaminder he had the hereditary right of advising the government, and his advice was that there existed no cogent reason for the break up of Bengal. Manindra said that administrators like Lord Roberts and Sir Henry Cotton were against the Partition which would 'rend asunder the ties of centuries, break up associations which are part of our being and I fear may even alienate the sympathies of the people from the Government.' The resolution to Boycott the use of foreign goods was passionately approved.' – (page 125)

৮. *বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ*, ২০০৫, পৃ. ৫৪৯

৯. *ভারতকোষ (৫ম খণ্ড)* — বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ৬

১০. *বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)* — রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ২৪

১১. *রবিজীবনী (পঞ্চম খণ্ড)* — প্রশান্তকুমার পাল, ১৯৯০, পৃ. ২৫৬-২৬১

১২. ঘোষণায় বর্ণিত কার্যক্রমগুলি হল —

১. রাখীবন্ধন — এই প্রাচীন প্রথাকে নতুন করে সঞ্জীবিত করা হল। অবিভক্ত বাংলাকে একসূত্রে আবদ্ধ রাখতে প্রতীক স্বরূপ সকলের হাতে বেঁধে দেওয়া হবে রাঙা সুতো।

২. অনশন দিবস — কোন গৃহে রান্না হবে না, আগুন জ্বলবে না। কেবলমাত্র রুগ্ন ও অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য রান্না হবে।

৩. দোকান-পাট বন্ধ থাকবে।

৪. কাজকর্ম বন্ধ থাকবে।

৫. সকলকে খালি পায়ে চলতে হবে।

৬. দেহ মন পরিশুদ্ধির জন্য প্রাতে সকলে গঙ্গাস্নান করবে।

— 'বাংলার মুকুটহীন রাজা' স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রস্তাবে সমর্থ জানান স্যার তারকনাথ পালিত (১৮৩১-১৯১৪) ও ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১)।

১৩. PROCLAMATION :

'Whereas the government has thought fit to effectuate the Partition of Bengal inspite of the universal protest of the Bengali nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our Province and to maintain the integrity of our race. So Got help us.'

ঘোষণাবলির অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

'যেহেতু সমগ্রজাতির প্রতিবাদ সত্ত্বেও বাংলা দেশকে ভাগ করার সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেছেন, সেইহেতু আমরা এতদ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছি ও ঘোষণা করছি যে জাতি হিসাবে আমরা

আমাদের প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করার কুফলকে সাধ্যমত সর্বপ্রকারে প্রতিরোধ করব এবং আমাদের জাতির অখণ্ডতা রক্ষা করব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।'

১৪. *বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)* — রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ৩৬

১৫. *রবিজীবনী (পঞ্চম খণ্ড)* — প্রশান্তকুমার পাল, পৃ. ২৭০

১৬. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী — লীলা মজুমদার :

'গগনচন্দ্র হোমের কন্যা বীণা বসু তখন চার বছরের মেয়ে। ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের একটা মনোরম সকালের স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি। বাড়ির ছোট মেয়েদের স্নান করিয়ে পরিষ্কার জামাকাপড় পরিয়ে রাস্তার দিকের উপরের বারান্দায় বসানো হয়েছে এবং বারবার নিষেধ করা হয়েছে তাদের কথা না বলতে। নিঃশব্দে তারা কিছু ঘটতে যাচ্ছে বলে অপেক্ষা করছে।

'শীঘ্রই বাতাসে গানের সুর ভেসে এল। তারপর দেখা গেল একদল লোক রাস্তার মাঝখান দিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছে। লম্বা ও সুদর্শন চেহারার এক ব্যক্তি, মাথার লম্বা চুল, গালে সোনালী দাড়ি লম্বা সাদা ঝোলানো পোশাক পরা, গায়কদলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তাঁর সুন্দর কণ্ঠস্বর সবার কণ্ঠস্বরকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। তাঁর পরেই ছিলেন এক মোটাসোটা ব্যক্তি — গলা থেকে তাঁর একটা হারমোনিয়াম ঝুলছিল, তার গলার স্বরও উচ্চ।

মেয়েটি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল ওঁদের, সে সময় উপেন্দ্রকিশোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁর হাতে বেহালা। তিনি ওই লম্বা সুন্দর চেহারার মানুষটির সাথে গেলেন এবং দলটি গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ ধরে বাতাসে তাঁদের কথা ভেসে বেড়ালো — 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল' — ইত্যাদি। তারপর যারা বাড়ির বাইরে এসেছিলেন, তারাও ফিরে গেছেন নিজের ঘরে।

ছোট্ট মেয়েটির মনে হয়েছিল সাদা পোশাকের ওই মানুষটি নিশ্চয় দেবতা হবেন। দেবতা ছাড়া অমন দেখায় না। অনেক বছর পর তাকে কেউ জানিয়েছিল, ওই মানুষটি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং মোটাসোটা বালকটির নাম দিনেন্দ্রনাথ — রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথের নাতি। ওঁরা সবাই ওদিন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বেরিয়েছিল।' — (পৃ. ৩৭-৩৮)

১৭. *ভারতের ইতিহাস* — অতুলচন্দ্র রায়, পৃ. ৬৩

১৮. *নথিপত্রে স্বদেশী আন্দোলন* — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১, পৃ. ১৯

১৯. *পুলিশ ফাইলে স্বদেশী আন্দোলন* — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (*নথিপত্রে স্বদেশী আন্দোলন*, পৃ. ১৮-১৯)

২০. *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান (প্রথম খণ্ড)* — সাহিত্য সংসদ :

'স্বদেশি যুগে যুবকদের দিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে শোভাযাত্রা করতেন। পুলিশের সামনে যাবার আগে সাবধান করে বলতেন, 'যাদের ভয় আছে তারা সরে পড়ো। চলে যাও। এরপরে যে বা যারা ভাগবে তারা মানুষ নয়, কুকুর বেড়াল।' কারাবরণটা তাঁর কাছে ছিল 'জল-ভাত।' — (পৃ. ৬৮৬)

২১. *ভারতের ইতিহাস* — অতুলচন্দ্র রায়, পৃ. ৬৩

২২. *নথিপত্রে স্বদেশী আন্দোলন* — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়,২০১১, পৃ. ১৯

২৩. *নথিপত্রে স্বদেশী আন্দোলন* — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১, পৃ. ১৯

২৪. *মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার* — ২০০৩, পৃ. ১৩০

২৫. *অভিভাষণ : 'মানসী,'* বৈশাখ, ১৩২১,পৃ. ৪২০

২৬. *সাহিত্য সাধক চরিতমালা (ষষ্ঠ খণ্ড)* — বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ৩৯

২৭. *মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার* — ২০০৩, পৃ. ১৩১

২৮. ৫ ভাদ্র, ১৩২১ বঙ্গাব্দ (ইং ১৯১৪) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে স্বরচিত ও স্বহস্তলিখিত অভিনন্দন পত্র দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বি. দ্র. — এই ধারাবাহিক আন্দোলনে আশঙ্কিত হয়ে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর দিল্লির দরবারে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ করার কথা ঘোষণা করেন।